Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XII, Issue-IV, July 2024, Page No.183-191
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

সাংখ্যদর্শনের প্রেক্ষিতে দুঃখ ও দুঃখ মুক্তির পথ: একটি আলোচনা

সৌরভ মজুমদার
পিএইচ. ডি. রিসার্চ স্কলার, দর্শন বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:
In this article, I have tried to present novel ideas about the path of freedom from Suffering, and Sorrow in the context of Sāṃkhya Philosophy. All Indian Philosophies recognize the indispensability of the practice of philosophy to the needs of community life. The aim of philosophy is not merely the cessation of curiosity, but the attainment of Moksha in the form of a life, free of suffering and absolute Puruṣārtha. In philosophy, it is practiced to conquer the sorrows, misfortunes, diseases, sufferings, burdens, etc. of life. So all the Indian philosophies except Chārvāka have discussed the way out of communal sufferings. Sadly, though there are differences of opinion as to the means of getting rid of suffering, all are eager to achieve the goal of getting rid of suffering. Sadness has also been acknowledged in Sāṃkhya philosophy. According to Sāṃkhya, all things are composed of the three qualities of Sattva, Rajas and Tamas. Because the quality is sorrowful, sorrow is latent in all things. So there is sorrow everywhwre and it is possible to get rid of it . In the first part of this article, after a brief discussion on Puruṣārtha, the nature of suffering will be known and a novel way of how to get rid of this suffering will be discussed in the context of Sāṃkhya Philosophy.

Keywords: Suffering, Puruṣārtha, Prakŕiti, Purusha, Moksha.

ভূমিকাঃ ভারতীয় দর্শনে জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা যেমন বিচিত্র, পরম সত্যের উপলব্ধিও তেমন বহুমুখী। বহুমুখী উপলব্ধিকে কেন্দ্র করে ভারতীয় দর্শনে আবির্ভূত হয়েছে বিভিন্ন সম্প্রদায়। তবে বিভিন্ন ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায় যে একটির পর একটি আবির্ভূত হয়েছে তা নয়, আসলে বিভিন্ন সূত্রাকারগণকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সম্প্রদায় তৈরি হয়েছে এবং এক এক সম্প্রদায়ের সমর্থকগণ সেই সূত্রাকারের মতকে যুক্তিগ্রাহ্য করে প্রচার করেছেন। বিভিন্ন সম্প্রদায় অন্যান্য সম্প্রদায়ের মতকে খণ্ডন করে এবং স্বমতকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছেন। তবে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে হয়তো কোনো একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের মতবাদ প্রাধান্য পেয়েছে। আবার যুগের পরিবর্তনে হয়তো সেই সম্প্রদায়ের মতবাদ প্রাধান্য ও অনুশীলন হারিয়েছে এবং অপর কোনো সম্প্রদায় প্রাধান্য পেয়েছে। এইভাবে বিভিন্ন মনীষীর দ্বারা বিভিন্ন সম্প্রদায় প্রচারিত ও পরিচর্যিত হয়েছে। বস্তুতঃপক্ষে দৃষ্টিভঙ্গির স্বাতন্ত্র্যে ও যৌগিক উৎকর্ষে প্রতিটি সম্প্রদায়ই স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। ভারতীয় বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায় গুলির এটিই প্রধান বৈশিষ্ট্য।

ভারতীয় জীবন-জিজ্ঞাসা নিবৃত্ত হয়েছে বিভিন্ন মুনি-ঋষির আত্মচৈতন্যে উপলব্ধ সত্যের নির্দিধ্যাসনের মাধ্যমে। এক এক জন মুনি বা ঋষি এক এক ভাবে পরমসত্যকে উপলব্ধি করেছেন। এই সত্যের বিভিন্ন

ধারার উপলব্ধিতে ভারতীয় দর্শন মূলত দুটি ভাগে বিভক্ত। যথা - আস্তিক এবং নাস্তিক। প্রচলিত ভাবে আস্তিক বলতে বোঝায় যারা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী। আর নাস্তিক হল যারা ঈশ্বরে বিশ্বাসী নয়। এ বিষয়ে পাণিনি তাঁর অষ্টাধ্যায়ী গ্রন্থে বলেন - *অস্তিনাস্তিদিষ্টং মতিঃ*।[১] অর্থাৎ মতি যার আছে সেই হল আস্তিক এবং যার মতি নেই সে হল নাস্তিক। এ বিষয়ে পরবর্তীতে ব্যাকরণবিদ ভট্টোজী দীক্ষিত বলেছেন - *অস্তি পরোলক ইত্যেবং মতির্যস্য স আস্তিকঃ। নাস্তিক মতির্যস্য স নাস্তিকঃ।* অর্থাৎ পরলোক ও জন্মান্তরে যাঁরা বিশ্বাসী তারা হলেন আস্তিক এবং যারা অবিশ্বাসী তারা হলেন নাস্তিক। কিন্তু ভারতীয় দর্শনে 'আস্তিক' বলতে তাঁদেরকেই বোঝায় যাঁরা বেদকে প্রমাণ বলে স্বীকার করেন অর্থাৎ যাঁরা বৈদিক জীবনচর্যা ও দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্বাসী। আর যাঁরা বেদকে প্রমাণ বলে স্বীকার করেন না, যাঁরা বৈদিক জীবনচর্যা ও দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্বাসী নন, তাঁরা 'নাস্তিক' বলে অভিহিত হন। আচার্য মনু 'মনুসংহিতা'-য় 'নাস্তিক' বলতে - '*নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ*[২] অর্থাৎ বেদ নিন্দুককে নাস্তিক বলে বুঝিয়েছেন। সহজ কথায়, আস্তিক দর্শন হল বৈদিক দর্শন এবং নাস্তিক দর্শন হল অ - বৈদিক দর্শন। আস্তিক দর্শনের অন্তর্গত ছয়টি সম্প্রদায়। যথা - ১) সাংখ্য দর্শন ২) যোগ দর্শন ৩) ন্যায় দর্শন ৪) বৈশেষিক দর্শন ৫) মীমাংসা দর্শন ৬) বেদান্ত দর্শন। এই ছয়টি দর্শন 'ষড়দর্শন' নামে প্রসিদ্ধ। এই ষড়দর্শনের মধ্যে সাংখ্য ও মীমাংসা দর্শনে ঈশ্বর স্বীকৃত না হলেও যেহেতু তারা বেদের প্রামাণ্যে বিশ্বাসী তাই তারা আস্তিক সম্প্রদায় অন্তর্ভূক্ত। নাস্তিক দর্শনের মধ্যে প্রসিদ্ধ হল চার্বাক, বৌদ্ধ ও জৈনদর্শন। তার মধ্যে চার্বাক হল নাস্তিক শিরোমণি, যেহেতু প্রবলভাবে বেদবিরোধী। প্রসঙ্গত বৈয়াকরণ সম্প্রদায় এবং আয়ুর্বেদ সম্প্রদায়ও আস্তিক নামে পরিচিত। এছাড়াও বেশ কয়েকটি স্বল্পপ্রসিদ্ধ আস্তিক দর্শন আছে।

মূল বিষয়বস্তুঃ যে কোনো শাস্ত্র পাঠক পাঠ করবার পূর্বে তাঁর মনে প্রশ্ন জাগে এই শাস্ত্র অধ্যয়নে আমার কী প্রয়োজন সাধিত হবে। তাহলে প্রশ্ন হয় ভারতীয় দর্শন পাঠের প্রয়োজনীয়তা কি? তার উত্তরে বলা যায় সকল ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায় এই শাস্ত্রকে জীবনের প্রয়োজনে অপরিহার্য বলেন। শুধু কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য দর্শন চর্চার প্রয়োজন নয়, জীবনকে দুঃখ মুক্ত ও পরমপুরুষার্থ তথা মোক্ষ লাভ করাই মূল উদ্দেশ্য। বিভিন্ন দর্শন সম্প্রদায়ে দুঃখ থেকে মুক্তি লাভের ভিন্ন ভিন্ন উপায় নির্দেশিত হয়েছে। এই প্রবন্ধের প্রথমে পুরুষার্থ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর, দুঃখের স্বরূপ সম্পর্কে অবগত হয়ে সাংখ্য দর্শনের প্রেক্ষিতে এই দুঃখ থেকে কীভাবে মুক্তি পাওয়া যায় এবং মোক্ষলাভের পথ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

'পুরুষার্থ' শব্দের অর্থ পুরুষ বা মানুষের অর্থ বা কাম্য বিষয়। পুরুষার্থের লক্ষণে বলা হয়েছে -*'যেন প্রযুক্ত পুরুষঃ প্রবর্ত্ততে, স পুরুষার্থ'*। অর্থাৎ যার দ্বারা প্রযুক্ত - যত্নবান হয়ে পুরুষ তার সাধনে চেষ্টা করে তাই পুরুষার্থ। অতএব পুরুষার্থ হল সেই বিষয় যার দ্বারা পুরুষের প্রয়োজন সাধন হয়। মহর্ষি জৈমিনি মীমাংসা সূত্র গ্রন্থে বলেছেন - '*যস্মিন প্রীতিঃ পুরুষস্য তস্য লিপ্সার্থ লক্ষণ অবিভক্তত্বাৎ* (৪/১/২) অর্থাৎ যে বিষয়ে মানুষের প্রীতি হয়, তাহাই পুরুষার্থ, তাহার যে লিপ্সা বা অনুষ্ঠান তাহা অর্থত অর্থাৎ স্বাভাবিক অনুরাগবশত প্রাপ্ত।[৩]একজন চৈতন্যযুক্ত মানুষের জীবন ধারণের জন্য যে গুলির প্রয়োজন হয় তাহল পুরুষার্থ। ফলে পুরুষার্থ চরম ও পরম মূল্যবান। পুরুষার্থ চার প্রকার - ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। এই চারটিকে একত্রে চতুর্বর্গও বলা হয়। ভারতীয় শাস্ত্রে সাধারণত ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চার প্রকার পুরুষার্থকে মূল্যবান রূপে গণ্য করা হলেও এদের মধ্যে কখনও কখনও প্রভেদ লক্ষ্য করা যায়। যেমন - অনেকের মতে কামই একমাত্র পুরুষার্থ; আবার কারও কারও মতে কেবল ধর্মই শ্রেষ্ঠ; আবার অনেকের মতে ধর্ম, অর্থ ও কাম হল মুখ্য পুরুষার্থ। এই তিনটি পুরুষার্থকে 'ত্রিবর্গও' বলা হয়। অনেকে আবার ধর্ম,

অর্থ, কাম ও মোক্ষকে পুরুষার্থ বলেন। এই চারটি পুরুষার্থকে 'চতুর্বর্গও' বলা হয়। মোক্ষবাদী দার্শনিকরা চতুর্বর্গের উল্লেখ করেন এবং মোক্ষকে পরম পুরুষার্থ বলেন। মোক্ষকে লাভ করলে আর কিছুই কামনা করার থাকে না, তাই তা পরম পুরুষার্থ। সাধারণ মানুষ, যারা পরমপুরুষার্থ মোক্ষ-এর ব্যাপারে তত আগ্রহী নয়, তাদেরকে লক্ষ্য করেই শাস্ত্রে ধর্ম, অর্থ, ও কাম এই ত্রিবর্গকে পুরুষার্থরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। বৈদিক ঋষিরা ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চার ধরনের মূল্যবোধের কথা বলেছেন। এগুলিকেই বলা হয়েছে পুরুষার্থ।[৪]

ধর্ম: ধর্ম হল চতুর্বিধ পুরুষার্থের মধ্যে প্রথম পুরুষার্থ। 'ধৃ' ধাতুর উত্তর 'মন্' প্রত্যয় করে ধর্ম শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। যা ধারণ করে তাই ধর্ম। 'যা সমগ্র বিশ্বকে ধারণ করে আছে, যা সমগ্র বিশ্বের শৃঙ্খলাকে রক্ষা করে, তাই ধর্ম'('ধর্ম বিশ্বস্য জগতঃ প্রতিষ্ঠা')। অর্থাৎ ধর্মের অভাবে জগতে শৃঙ্খলার অভাব ঘটত।[৫]ঋগ্বেদে 'ঋত'কে 'ধর্ম' বলা হয়েছে। ঋত জীবজগৎ ও জড়জগৎ কে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে। জগতের প্রত্যেক বস্তু নিজস্ব নিয়মে চলে, নিজের স্বভাব-নিয়মে চলে এবং সেটাই তার ধর্ম। যথা - জলের স্বভাব তৃষ্ণা নিবারণ করা এবং সেটাই তার ধর্ম। আবার লৌকিক অর্থে ধর্ম হল ঈশ্বরের আরাধনা। কিন্তু ধর্মশাস্ত্রে ও নীতিশাস্ত্রে এর অর্থ হল সামাজিক আচরণ বিধি যা প্রত্যেক মানুষের অনুসরণীয়। সমাজে বসবাসকারী মানুষ নিজের এবং অপরের কল্যাণের জন্য মানুষকে যেসব আচরণবিধি অনুসরণ করতে হয়, সেটাই তার ধর্ম। ব্যক্তি তথা সমাজ তথা বিশ্ববাসীর কল্যাণের জন্য কর্ম সাধনাই মানুষের ধর্ম। মনুসংহিতা (৪/১৩৮) শ্লোকে বলা হয়েছে -

> *"সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ ন ব্রূয়াৎ সত্যম অপ্রিয়ম্*
> *প্রিয়ং চ নানৃতম ব্রূয়াৎ এষ ধর্মঃ সনাতনঃ।"*

অর্থাৎ "অপরকে আঘাত না করে যা সত্য ও প্রিয় তা বলা উচিত, যদিও অপ্রিয় সত্য বলা উচিত নয়। প্রিয় হলেও মিথ্যা বলা উচিত নয়, সনাতন ধর্ম একথাই বলে।" মনুসংহিতায় আরও বলা হয়েছে - "প্রাণীদের পীড়া না দিয়ে ক্রমে ক্রমে ধর্মসঞ্চয় করা উচিত।" বস্তুত মনুর ধর্মের ধারণাই আরও সুস্পষ্টভাবে মহাভারতে বলা হয়েছে - "ধর্ম হল যা জগতে কল্যাণ ও অহিংসা আনয়ন করে।"[৬]

অনেকে আবার বেদবিহিত জীবনযাত্রাকে 'ধর্ম' বলেছেন। আবার ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য ধর্ম প্রসঙ্গে 'যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি'-তে বলেন - অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, দান, দম, দয়া, ক্ষান্তি এই নয়টি ধর্মের সাধন।[৭] মনু 'মনুসংহিতা'য় বলেন - *"ধৃতিঃ ক্ষমা দমোহস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ। ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্মলক্ষণম্।"*[৮] অর্থাৎ ধৃতি (ধারণ বা ধৈর্য), ক্ষমা, দম (সৎ আচরণ), অস্তেয় (চুরি না করা), শৌচ (দেহ ও মনের শুচিতা), ইন্দ্রিয় নিগ্রহ (ইন্দ্রিয়ের গুণগুলি বিদ্যমান তিনি নৈতিকতার শীর্ষে অবস্থান করে সমাজে অনুসরণীয় হন। নিয়ন্ত্রণ), ধী (শাস্ত্র জ্ঞান), বিদ্যা (আত্মজ্ঞান), সত্য ও অক্রোধ এই দশটি ধর্মের লক্ষণ। যে ব্যক্তির মধ্যে এই গুণগুলি বিদ্যমান তিনি নৈতিকতার শীর্ষে অবস্থান করে সমাজে অণুসরণীয় হন।

অর্থ: 'অর্থ' হল দ্বিতীয় পুরুষার্থ। অর্থকে পুরুষার্থরূপে গণ্য করে ভারতীয় নীতিশাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, ব্যক্তির প্রয়োজনে, পারিবারিক দায়িত্ব পালনে, সামাজিক কর্তব্য সাধনের জন্য এবং ধর্ম পালনের জন্য অর্থ মানুষের কাম্যবস্তু। তবে অর্থের উপার্জন সৎপথে হতে হবে, অসৎপথে অর্থ উপার্জন যথার্থ নয়। ধর্মানুকূল অর্থই যথার্থ পুরুষার্থ। অর্থের উদ্দেশ্য হল ধর্মলাভ। মনুর মতে, অর্থের শুচিতা সর্বাগ্রে রক্ষা করা উচিত।

সৎপথে অর্থ উপার্জনের মাধ্যমে জীবনযাপন করতে হবে এবং জীবনযাপনের প্রয়োজন মিটে গেলে অধিক অর্থ উপার্জন থেকে বিরত থাকতে হবে।

কাম: ভারতীয় শাস্ত্রে 'কাম'কে তৃতীয় পুরুষার্থ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কাম বলতে বোঝায় কামনা বাসনা। সাধারণ মানুষ জীবনের চরমলক্ষ্য সম্পর্কে অবহিত না থাকার জন্য তারা অর্থ ও কামের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। তাই বৈদিক শাস্ত্রে অর্থ ও কামকে পুরুষার্থ বলা হয়েছে। ধর্ম, অর্থ ও কাম এই তিনটি পুরুষার্থকে সমানভাবে সেবা করার কথা বলা হয় ধর্মশাস্ত্রে। কিন্তু কাম অর্থাৎ ইন্দ্রিয় উপভোগ জনিত সুখের কামনা আধ্যাত্মিক জীবনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা। এদের মধ্যে যৌন সুখ এবং ক্ষুধা বোধ সবচেয়ে শক্তিশালী ও বিপজ্জনক। এদের নিয়ন্ত্রণ আধ্যাত্মিক জীবনের পক্ষে অপরিহার্য। কাজেই অসংযত কাম পুরুষার্থ নয়; নীতিসম্মত ও শাস্ত্রবিহিত কামই পুরুষার্থ।

মোক্ষ: ভারতীয় নীতিশাস্ত্রে উল্লেখিত চতুর্বর্গ -এর মধ্যে চতুর্থ তথা সর্বশ্রেষ্ঠ প্রধান পুরুষার্থ হল মোক্ষ। মনুষ্যজীবনের প্রধান লক্ষ্যই হল মোক্ষলাভ করা। মানবজীবনের সামগ্রিক দুঃখের আত্যন্তিক অবসান ঘটানো হল মোক্ষ। তাই মানুষের চরম কাম্য বস্তু হল মোক্ষ। যাকে লাভ করলে আর কিছু পাবার অপেক্ষা থাকে না। যাকে পেলে সব পাওয়া হয়ে যায়। অপরাপর পুরুষার্থ গুলি মোক্ষ লাভের সহযোগী মাত্র। মোক্ষ বলতে বোঝায় অবিদ্যা থেকে, জীবন যন্ত্রণা থেকে, বন্ধন থেকে 'চিরমুক্তি'। এই মোক্ষকে ভারতীয় দর্শন বিভিন্ন সম্প্রদায় গুলি অপবর্গ, কৈবল্য, নির্বাণ, নিঃশ্রেয়স প্রভৃতি শব্দের সাথে সমার্থক বলেছেন। মোক্ষের স্বরূপ বিষয়ে ভারতীয় দার্শনিকদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও চার্বাক ব্যাতীত সকল সম্প্রদায় মোক্ষকে পরম পুরুষার্থ রূপে অভিহিত করেছেন।

সমস্ত ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়ই জীবনের প্রয়োজনে দর্শন চর্চার অপরিহার্যতাকে স্বীকার করেন। শুধু কৌতূহল নিবৃত্তিই দর্শন চর্চার উদ্দেশ্য নয়, জীবনকে দুঃখমুক্ত, সুন্দরতর করাই দর্শন আলোচনার উদ্দেশ্য। এজন্য প্রবন্ধের প্রারম্ভেই তাই পুরুষার্থ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বেশিরভাগ ভারতীয় দার্শনিকগণ পরম পুরুষার্থ মোক্ষ লাভের পথ নির্দেশের জন্য দর্শনচর্চা করেন। জীবনের দুঃখ, দুর্গতি, রোগ, শোক, জরা ইত্যাদি জয়ের সাধনাই হল দর্শনচর্চার মূল। তাই চার্বাক্ ব্যাতীত প্রায় সমস্ত ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়ই দুঃখ ও দুঃখ নিবৃত্তির পথ নিয়ে আলোচনা করেছেন। আমাদের দেশের দার্শনিকদের বিচারে জগতে সুখের চেয়ে দুঃখের মাত্রা অনেক বেশি। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সবর্ত্রই দুঃখের বর্ষার প্রাবল্য, মাঝে মাঝে যে সুখের অভিজ্ঞতা হয় তা তো সাময়িক বিদ্যুতের বিকাশ মাত্র। কান্না মধ্যে দিয়ে আমাদের জীবন যাত্রা শুরু হয়, সে জীবনে কান্না আর থামতে চায় না। জীবনে ভোগ্য বস্তু পেলেও যেমন দুঃখ, না পেলেও সেরকম দুঃখ। পেলেও দুঃখ এই ভেবে যে, আরও পেলাম না কেন। তাই তো কবিগুরু বলেন - 'এ জগতে হায় সেই বেশি চায়, আছে যার ভুরি ভুরি। মহাভারতেও বলা হয় - 'ন জাতু কামঃ কামানাম্ উপভোগেন শাম্যতি' অর্থাৎ কাম কখনই কামোপভোগের দ্বারা তৃপ্ত হয় না। অগ্নিতে কাষ্ঠ সংযোগ করলে অগ্নি কি কখনও নির্বাপিত হয়? সুতরাং পেলেও দুঃখ, আর না পেলে দুঃখ তো হবেই। তাহলে প্রশ্ন ওঠে দুঃখ কি ? দুঃখের স্বরূপ বিষয়ে ন্যায়সূত্রে বলা হয় –

'বাধনালক্ষণং দুঃখম্' - ন্যায়সূত্র - ১। ১। ২১

অর্থাৎ দুঃখ হল আমাদের কামনা, বাসনা, প্রভৃতির পূর্ণতার অভাব। বিষয় সংকল্পই হল দুঃখ। পীড়া, তাপ ইত্যাদি বাধনার লক্ষণ বা স্বরূপ হল দুঃখ। দুঃখের স্বরূপ বিষয়ে তর্কসংগ্রহে বলা হয় সকল প্রাণীর যা

স্বাভাবিক প্রতিকূল বা দ্বেষের বিষয় তাই হল দুঃখ। সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদীতে বলা হয় দুঃখ হল সকলের জ্ঞাত রজোগুণের পরিণাম বিশেষ। আবার যোগ দর্শনে বলা হয় বিষয়মাত্রই দুঃখ স্বরূপ। সাধারণ মানুষ তা উপলব্ধি করতে না পারলেও বিবেকী ব্যক্তিগণ তা বুঝতে পারেন। সুখের পরিণামে দুঃখ হয়। তাপ বা তাপজনকবশত, সুখ ও দুঃখ, সুখভোগজনিত সংস্কারবশত পুনরায় সেই সুখ পাবার ইচ্ছা হয়, আর গুণগুলির পরস্পর বিরোধবশত বিবেকীর কাছে সমস্ত সুখই দুঃখ। জৈন, মীমাংসা ও বেদান্ত দর্শনেও জীবদ্দশাকে দুঃখময় বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বস্তুত ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়গুলির উৎস উপনিষদসমূহ ব্রহ্ম ব্যাতীত সবকিছুকে দুঃখময় বলে বর্ণনা করেছেন। গীতাতেও জন্ম, মৃত্যু ও জরা বা ব্যাধিকে দুঃখ বলা হয়েছে। তবে ভারতীয় দার্শনিকগণ কেবল দুঃখের স্বরূপ বলেন নি, দুঃখ থেকে মুক্তির পথ বা উপায়ও নির্দেশ করেছেন। শিরোনাম অনুযায়ী প্রবন্ধটিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে সাংখ্য দর্শনের মধ্যে প্রবেশ করা হল। এই প্রবন্ধের মধ্যে মূলত সাংখ্য দর্শনের প্রেক্ষিতে দুঃখ ও দুঃখ মুক্তির পথ বিষয়ক একটি আলোচনা প্রস্তুত করা হবে।

ভারতীয় বৈদিক ষড়দর্শনের মধ্যে সাংখ্য দর্শনকে অন্যতম প্রাচীন দর্শন বলে গণ্য করেন, আদিবিদ্বান কপিল মুনি সাংখ্য দর্শনের প্রবক্তা ও প্রতিষ্ঠাতা। ছান্দোগ্য, প্রশ্ন, কঠ এবং বিশেষ করে শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদে, মহাভারতে, ভগবদ্গীতা, স্মৃতি ও পুরাণে সাংখ্যমতের উল্লেখ পাওয়া যায়। সাংখ্য দর্শনের নামকরণ সম্পর্কে বিভিন্ন অভিমত আছে। অনেকের মতে 'সংখ্যা' শব্দ থেকেই সাংখ্য শব্দের উৎপত্তি। সংখ্যা শব্দের অর্থ পরিসংখ্যান বা গণণা। সাংখ্যকার পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের পরিসংখ্যান বা গণণা করেন বলেই তাঁদের দর্শনকে সাংখ্যদর্শন বলা হয়। আবার অনেকের মতে 'সাংখ্য' শব্দের অর্থ 'সম্যক জ্ঞান'। 'সৎ' অর্থে সম্যক এবং 'খ্যা' অর্থে জ্ঞান। এই অর্থে যে শাস্ত্র পাঠ করলে সম্যক জ্ঞান লাভ করা যায় তারই নাম সাংখ্য দর্শন।

ভারতীয় দার্শনিকদের চিন্তাভাবনার মূল বিষয়রূপে দুঃখকে গণ্য করা হয়ে থাকে। কেননা সকল ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়ই দুঃখ নিয়ে আলোচনা করেছেন। তবে দুঃখের স্বরূপ, দুঃখ থেকে মুক্তির উপায় বিষয়ে মতপার্থক্য থাকলেও, দুঃখ থেকে পরিত্রাণ লাভের উদ্দেশ্যে সকলেই তৎপর। অধিকাংশ দার্শনিকদের মতে সুখ বলে প্রকৃতপক্ষে কিছু হয় না। দুঃখের অভাবই হল সুখ। অতীব বিষয় ভোগের বাসনা আমাদের সবসময় বেড়েই চলে। যার জন্য আমরা সুখের অনুভব করতে পারি না। যেমন - বৌদ্ধমতে জগৎ ও জীবন হল দুঃখময়। জীবজীবন নিরবচ্ছিন্ন দুঃখে পূর্ণ। দুঃখবিহীন জীবন কল্পনাতীত। ন্যায়মতে দুঃখ হল দ্বাদশ প্রমেয় পদার্থের অন্তর্গতএকাদশ পদার্থ। আত্মাদি প্রমেয় পদার্থ বিষয়ে মিথ্যাজ্ঞানই সংসারের নিদান অর্থাৎ মূলীভূত কারণ এবং সেই মিথ্যাজ্ঞানই সর্ব দুঃখের মূল। তেমনই সাংখ্যমতে দর্শনেও দুঃখকে স্বীকার করা হয়েছে। সাংখ্যমতে সমস্ত বস্তুই সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ - এই গুণত্রয়ের সমন্বয়ে গঠিত। রজো গুণ যেহেতু দুঃখময়। তাই সকল বস্তুর মধ্যেই দুঃখ সুপ্ত অবস্থায় আছে। সুতরাং দুঃখ বিদ্যমান।

পণ্ডিত ঈশ্বরকৃষ্ণ সাংখ্যকারিকা গ্রন্থে দুঃখের স্বরূপ বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে কিছু না বললেও সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদীতে বাচস্পতি মিশ্র বলেছেন - '*দুঃখং রজঃ পরিণামভেদ*' অর্থাৎ দুঃখ হল রজোগুণের পরিণাম বিশেষ। রজোগুণের পরিণাম বিশেষ হওয়ায় দুঃখ স্বরূপত রজোগুণ। রজোগুণ হল নিত্য। সুতরাং দুঃখ স্বরূপত নিত্য। আর যা নিত্য তার বিনাশ সম্ভব হয় না। ফলে দুঃখেরও নাশ হয় না। তবে দুঃখ রূপে পরিণামপ্রাপ্ত রজোগুণ পুনরায় তার সূক্ষ্ম অবস্থা রজোগুণে অভিভূত হতে পারে। অতএব দুঃখের নাশ সম্ভব

না হলেও দুঃখের অভিভব সম্ভব। সেই কারণে দুঃখের নিবৃত্তি বলতে বোঝায় দুঃখের অভিভব বা নিবারণকে। সুতরাং দুঃখ আছে এবং তার নিবারণ করাও সম্ভব।

পণ্ডিত ঈশ্বরকৃষ্ণ প্রণীত সাংখ্যকারিকা গ্রন্থের শুরু হয়েছে - '*দুঃখত্রয়*' এই শব্দটি দিয়ে। দুঃখত্রয় - এই শব্দের দ্বারা সাংখ্যকারিকায় যে দুঃখের সংখ্যা 'তিন' এরূপ বলা হয়নি। 'বেদত্রয়' শব্দের দ্বারা তিনটি বেদকে বোঝালেও দুঃখত্রয় শব্দের দ্বারা তিনটি দুঃখ বোঝায় না। কারণ অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালে স্থিত অসংখ্য প্রাণীর অসংখ্য দুঃখ। এই ত্রিকালে স্থিত অসংখ্য প্রাণীর অসংখ্য দুঃখ ঈশ্বরকৃষ্ণের মতে তিনটি প্রকারযুক্ত। অতএব দুঃখ বলতে সাংখ্যকারিকায় - *'দুঃখানাং ত্রয়ং দুঃখত্রয়ম'* দুঃখসমূহের ত্রয় দুঃখত্রয় বা ত্রিবিধ দুঃখ - আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক নির্দেশ করা হয়েছে। যথা -

আধ্যাত্মিক দুঃখ: 'আধ্যাত্মিক' শব্দের অন্তর্গত 'আত্মা' শব্দের দ্বারা এখানে শরীর ও মনকে বোঝায়। সাংখ্যমতে আত্মাতে বা পুরুষে দুঃখ থাকতে পারে না, কেননা আত্মা বা পুরুষ হচ্ছে নিত্য- শুদ্ধ - বুদ্ধ - মুক্ত। কাজেই আধ্যাত্মিক দুঃখ দুই প্রকার - শারীরিক দুঃখ ও মানসিক দুঃখ। বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মার সাম্য থাকলে শরীর সুস্থ থাকে, বৈষম্য হলে ব্যাধি হয়। ব্যাধি শরীরের হয় বলে ব্যাধি জন্য দুঃখকে শারীরিক দুঃখ বলে। অপরদিকে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ভয়, ঈর্ষা, প্রিয়া-বিয়োগ ও অপ্রিয়-সংযোগের ফলে যে দুঃখ তা মানসিক দুঃখ।

আধিভৌতিক দুঃখ: 'আধিভৌতিক' শব্দের অন্তর্গত 'ভূত' শব্দের অর্থ 'স্থাবর' ও 'জঙ্গম'। এখানে স্থাবর অর্থে বৃক্ষ পর্বতাদিকে এবং জঙ্গম অর্থে মানুষ, পশু ইত্যাদিকে বোঝানো হয়েছে। আধিভৌতিক দুঃখ বাহ্যিক কারণের দ্বারা উৎপন্ন দুঃখ। মানুষ, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ এবং কণ্টক প্রস্তরাদির দ্বারা উৎপন্ন দুঃখ আধিভৌতিক।

আধিদৈবিক দুঃখ: আধিভৌতিক দুঃখের মতো আধিদৈবিক দুঃখও বহিরাগত বাহ্যিক কারণের দ্বারা উৎপন্ন। আধিদৈবিক শব্দের অন্তর্গত 'দৈব' শব্দের দ্বারা এখানে 'দেবযোনিকে' বোঝানো হয়েছে। বিদ্যাধর, অপ্সরা, যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব, কিন্নর, পিশাচ ও ভূত প্রেতকে বলা হয় 'দেবযোনি'। কোন অপদেবতার দ্বারা উৎপন্ন দুঃখই আধিদৈবিক। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি, বজ্রপাত, উল্কাপাত, ভূকম্পন, বন্যা প্রভৃতির দ্বারা উৎপন্ন দুঃখকে আধিদৈবিক দুঃখ বলা হয়।

সাংখ্যমতে মানুষমাত্রই এই ত্রিবিধ দুঃখতাপে তাপিত। মানুষ এই ত্রিবিধ দুঃখ থেকে মুক্তি কামনা করে। ঈশ্বরকৃষ্ণ বলেছেন, *'দুঃখত্রয়াভিঘাতাৎ জিজ্ঞাসা'*। এই ত্রিবিধ দুঃখভোগই হচ্ছে বন্ধন, আর ত্রিবিধ দুঃখের আত্যন্তিক ও ঐকান্তিক উচ্ছেদকে মুক্তি বলে। এবিষয়ে সাংখ্যসূত্র - *'ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্ত পুরুষার্থঃ*।[৯] সাংখ্যাচার্য মতে দৃষ্ট উপায়ের দ্বারা যেমন দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি অসম্ভব তেমনই আনুশ্রবিক বা বেদে বর্ণিত উপায়ের দ্বারাও দুঃখের একান্ত নিবারণও সম্ভব নয়। সাংখ্যমতে অনাদি অবিবেকবশত প্রকৃতি ও পুরুষের যে সংযোগ হয় তার ফলে চিত্তে পুরুষের প্রতিবিম্বপাত হলেই দুঃখসম্বন্ধস্বরূপ বন্ধন হয়। প্রকৃতিসংযোগ ছাড়া নিত্যশুদ্ধ পুরুষের দুঃখসংযোগরূপ বন্ধন সম্ভবপর হয় না। এ বিষয়ে সাংখ্যসূত্রে বলা হয়-'*ন নিত্যশুদ্ধবুদ্ধস্বভাবস্য তদযোগাৎ ঋতে*'।[১০]তাই প্রকৃতি ও পুরুষের বিবেকবশত সংযোগ নাশ হলেই পুরুষে আরোপিত দুঃখসমূহের নাশ হয়। এবিষয়ে সাংখ্যপ্রবচনভাষ্যকারের উক্তি-"*সংযোগনিবৃত্তিরেব সাক্ষাৎদুঃখহানোপায়ঃ*"।[১১]অতএব সাংখ্যশাস্ত্রকারগণের মতে এই বন্ধন যেহেতু প্রকৃতিসংযোগের জন্য পুরুষের বন্ধন হয় আর প্রকৃতিবিয়োগের জন্য পুরুষের বন্ধন নিবৃত্তি হয়। কাজেই বন্ধন পুরুষের স্বাভাবিক

ধর্ম নয়, নৈমিত্তিক ধর্মও নয়। এবিষয়ে বিজ্ঞানভিক্ষুপাদ বলেছেন - "*প্রকৃতিবিয়োগে বন্ধাভাবাৎ ঔপাধিক এব বন্ধো ন তু স্বাভাবিকো নৈমিত্তিকো বা*"।[১২]এখানে অবিবেকী যে প্রকৃতি পুরুষের সংযোগের হেতু তাও ভাষ্যকার স্পষ্ট করে বলেছেন - "*অবিবেক এব মুখ্যতঃ সংযোগহেতুরুক্তঃ*"।[১৩]আর যেহেতু বন্ধন অবিবেকসাপেক্ষ সেহেতু তার বিরোধী একমাত্র প্রকৃতি ও পুরুষের বিবেকজ্ঞানের দ্বারাই বন্ধননাশ বা মোক্ষ হয়ে থাকে। এবিষয়ে সাংখ্যকারিকায় বলা হয় - '*ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞবিজ্ঞানাৎ*'[১৪]অর্থাৎ ব্যক্ত বা কার্য, অব্যক্ত বা মূলপ্রকৃতি এবং জ্ঞ বা পুরুষ - এদের যথার্থভাবে জানলে তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং দুঃখনিবৃত্তি হয়।

সাংখ্যশাস্ত্রে আলোচিত হয় পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব। সেখানে বলা হয় মূল প্রকৃতি হল অবিকৃতি বা মূল কারণ, তার কোনো কারণ নেই তাই আদি কারণ। প্রকৃতি-বিকৃতি তত্ত্ব হল মহৎ, অহংকার এবং পঞ্চতন্মাত্র - এই সাতটি। এরা কার্যও বটে আবার কারণও বটে। কেবল কার্য বা বিকার হল ষোলোটি। যথা - পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চমহাভূত এবং মন। আবার প্রকৃতিও নয় আবার বিকৃতিও নয় অর্থাৎ কারণও নয়, কার্যও নয় তা হল পুরুষ। এই চারটি বিভাগ বিশিষ্ট পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের যথার্থ জ্ঞান জন্মালে প্রকৃতি পুরুষের ভেদসাক্ষাৎকারাত্মক তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়। তার ফলে গোড়ার থেকে বিদ্যমান যে অবিবেক অর্থাৎ প্রকৃতি পুরুষের ভেদ সাক্ষাৎকারের অভাব এবং তদজন্য পুরুষে আরোপিত বন্ধের নিবৃত্তি ঘটে অর্থাৎ ত্রিবিধ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয়। এই রূপ তত্ত্বজ্ঞানকে বিশুদ্ধ বা কেবল জ্ঞান বলা হয়েছে। এই জ্ঞানের পর আবার অবিবেক প্রসূত আমি কর্তা, আমি ভোক্তা ইত্যাদি মিথ্যাজ্ঞানের উদয় হয় না, তার নামই কেবল বা বিশুদ্ধ জ্ঞান। এই বিশুদ্ধ ভেদজ্ঞান বা বিবেকজ্ঞানই হল প্রকৃতপক্ষে তত্ত্বজ্ঞান।

সাংখ্যমতে বন্ধন প্রকৃতিরই, মুক্তিও প্রকৃতির হয়। ঈশ্বরকৃষ্ণ সাংখ্যকারিকায় বলেছেন -

> "*তস্মান্ন বধ্যতা ন মুচ্যতে সংসরতি কশ্চিৎ।*
> *সংসরতি বধ্যতে মুচ্যতে নানাশ্রয়াৎ প্রকৃতিঃ।।*"[১৫]

বাস্তবিকপক্ষে পুরুষের বন্ধন ও সংসারমুক্তি কখনোই হয় না। সাংখ্যমতে পুরুষ সর্বদা নিত্য, মুক্ত, শুদ্ধ, অকর্তা ও দ্রষ্টা। তাহলে প্রশ্ন হয় পুরুষ যখন মুক্ত হয়েই আছে, তখন তার পুনরায় মুক্তি কি ভাবে সম্ভব? যার বন্ধন আছে তার মুক্তি সম্ভব হতে পারে। কিন্তু যে মুক্ত সে তো সর্বদাই মুক্ত। তাহলে পুরুষের মুক্তির প্রসঙ্গ আসছে কেন? যেমন কল্পিত সর্পের বিরুদ্ধে প্রতিকারের চেষ্টা নিরর্থক, তেমনই বন্ধনরহিতের মুক্তির প্রচেষ্টা অবাস্তব। তাছাড়া বন্ধন বলতে সংস্কারের সাথে অবিদ্যাদি পঞ্চবিধ ক্লেশ ও ধর্মাধর্ম বোঝায়। পুরুষের বন্ধন হতে পারে না যেহেতু পুরুষ অপরিণামী ও নির্লেপ। সুতরাং পুরুষের সংসার হয় না। যেহেতু পুরুষ নিষ্ক্রিয়। পুরুষের প্রেত্যভাব না হওয়ায় জন্ম বা মৃত্যু নেই অর্থাৎ একদেহ সঙ্গে অপরদেহের সম্বন্ধ হয় না। তাহলে কি পুরুষের মুক্তি হয় না? সাংখ্যমতে পুরুষের কোনো দিনই বন্ধন হয় না কারণ পুরুষ হল চিরমুক্ত। প্রকৃতিই সংসারে বন্ধ ও মুক্ত হয়। বন্ধ, মোক্ষ, ও সংসার পুরুষে আরোপিত হয় মাত্র। প্রকৃতিজাত বুদ্ধিতত্ত্বের সাথে পুরুষের অভেদ প্রতীত হয় মাত্র তার ফলে বুদ্ধিগত সুখ, দুঃখ, জয়, পরাজয়, সংসার, মোক্ষ ইত্যাদি যাবতীয় বস্তুর আশ্রয় বা ভোক্তারূপে পুরুষের প্রতীতি জন্মায়। বুদ্ধিতত্ত্ব হল ত্রিগুণাত্মক ফলে সত্ত্বগুণের স্বচ্ছতাহেতু বুদ্ধিতত্ত্ব স্বসন্নিহিত বস্তুর প্রতিবিম্ব গ্রহণে সক্ষম হয়। প্রকৃতি সন্নিহিত পুরুষে বন্ধন, মোক্ষ ইত্যাদি আরোপিত হয় বলে বন্ধনাদিকে পুরুষের সাথে সম্বন্ধযুক্ত বলা হয়। কিন্তু তা যথার্থ নয়, ঔপচারিক মাত্র। প্রকৃতি পুরুষের পার্থক্য বা ভেদজ্ঞানের অভাবের ফলে বন্ধন, সংসার, মোক্ষ ইত্যাদি পুরুষের বলে মনে হয়। সুতরাং বন্ধন, মোক্ষ প্রকৃতির হয়।

অতএব আলোচিত হল যে প্রকৃতি-পুরুষের বিবেক বা অভেদজ্ঞানই সকলপ্রকার বন্ধন, দুঃখ ইত্যাদির মূল কারণ। তাই যখনই প্রকৃতি পুরুষের ভেদজ্ঞান উৎপন্ন হয় তখনই পুরুষ স্ব স্বরূপে অবস্থান করে এবং পূর্বে যে নিত্যমুক্ত ছিল বুঝতে পারে। ভেদজ্ঞানের দ্বারাই পুরুষের উপর আরোপিত প্রকৃতির যাবতীয় ধর্ম তিরোহিত হয় তখন পুরুষ নিজের স্থানে অবস্থান করে। ফলে দুঃখত্রয়ের অবসান ঘটে। আর এই দুঃখত্রয়ের আবির্ভাবের সম্ভবনা না থাকায় দুঃখত্রয়ের চিরনিবৃত্তি হয়। এরূপ দুঃখত্রয়ের চিরনিবৃত্তিকে কৈবল্য বা মোক্ষ বলা হয়। সুতরাং সাংখ্যমতে পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের যথার্থ জ্ঞান হলে প্রকৃতি-পুরুষের ভেদজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান জন্মায়, যার ফলে কৈবল্য বা মোক্ষ লাভ করা যায়।

সাংখ্যদর্শনে মোক্ষের দুটি প্রকার আছে। যথা - জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তি। তত্ত্বজ্ঞান লাভ হলেও প্রারব্ধ কর্মবশতঃ জীব কিছুদিন স্বদেহে অবস্থান করে। যতদিন না পর্যন্ত সমস্ত কর্মের ক্ষয় হয়। সেসময় ভোগবাসনা ব্যাতীত দেহ বিদ্যমান অবস্থায় থাকায় এইপ্রকার মুক্তির জীবন্মুক্তি। এই অবস্থায় জীব নিজেকে সুখ, দুঃখাদির ভোক্তারূপে মনে করে না। জীবন্মুক্তি ব্যক্তির সমস্ত কর্মের ক্ষয় করে দেহ ত্যাগের মাধ্যমে বিদেহ মুক্তি লাভ করে। তত্ত্বজ্ঞান লাভের দ্বারা যখন সমস্ত কর্ম যথা সঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ কর্ম নষ্ট হয়ে যায় এবং প্রারব্ধ কর্মও ভোগের দ্বারা দ্রুত ক্ষয় হয়ে যায় তখনই তত্ত্বজ্ঞানীর ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক মোক্ষ অর্থাৎ দুঃখত্রয়ের নাশ হয়। এই ত্রিবিধ দুঃখত্রয়ের নিবারণের মাধ্যমে পরমপুরুষার্থ অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করা হয়।

তথ্যসূত্র :

১. পাণিনিসূত্র - ৪/৪/৬০
২. মনু সংহিতা - ২/১১
৩. পূর্বমীমাংসা দর্শন, শ্রী সুখময় ভট্টাচার্য, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৩,পৃঃ- ৯৪
৪. “Philosophy of Values”, M. Hiriyanna, The Cultural Heritage of India, Vol.III, PP. 645 - 646
৫. “ভারতীয় দর্শন ও তার বিশিষ্ট পটভূমিকা”, গোপীনাথ ভট্টাচার্য, তত্ত্ব ও প্রয়োগ, ১৯৯৫,পৃঃ - ৫৪
৬. “The Manu Samhita” V. Raghavan, The Cultural Heritage of India, Vol. II, 1969,PP. 341-343.
৭. “Philosophy of Values”, M. Hiriyanna, The Cultural Heritage of India, Vol.III, PP. 647.
৮. মনু সংহিতা - ৬/১২
৯. সাংখ্যসূত্র - ১/১
১০. সাংখ্যসূত্র - ১/১১
১১. সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য - ১/১১
১২. সাংখ্যসূত্রভাষ্য - ১/১১
১৩. সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য - ১/৫০
১৪. সাংখ্যকারিকা - ২
১৫. সাংখ্যকারিকা - ৬২

গ্রন্থপঞ্জি:

১. গোস্বামী, নারায়ণচন্দ্র (সম্পাদক) - *সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী*, দ্বিতীয় প্রকাশ, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কোলকাতা, ১৯৯৪ খ্রীষ্টাব্দ।

২. বেদান্তচুঞ্চু, পূর্ণচন্দ্র (সম্পাদক) - *সাংখ্যকারিকা*, দ্বিতীয় মুদ্রণ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কোলকাতা, ২০০৭ খ্রীষ্টাব্দ।

৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র (সম্পাদক) - *মনুসংহিতা*, দ্বিতীয় সংস্করণ, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ১৪১৬বঙ্গাব্দ।

৪. ভট্টাচার্য, অমিত (সম্পাদক) - *চার্বাক দর্শন*, দ্বিতীয় সংস্করণ, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কোলকাতা, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ।

৫. ভট্টাচার্য, বিধুভূষণ - *সাংখ্য দর্শনের বিবরণ*, দ্বিতীয় মুদ্রণ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কোলকাতা, ২০০৪ খ্রীষ্টাব্দ।

৬. ভট্টাচার্য, ভূপেন্দ্রনাথ (সম্পাদক) - *সাংখ্য দর্শন*, সংস্কৃত কলেজ, কোলকাতা, ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দ।

৭. ভট্টাচার্য, সমরেন্দ্র - *ভারতীয় দর্শন*, তৃতীয় সংস্করণ, বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, কোলকাতা, ২০০৪ খ্রীষ্টাব্দ।

৮. শর্মা, উমাশঙ্কর (সম্পাদক) - *সর্বদর্শনসংগ্রহঃ*, প্রথম সংস্করণ, চৌখাম্বা বিদ্যাভবন, বারাণসী, ২০১৪ খ্রীষ্টাব্দ।

৯. Hiriyanna, M., *Outlines of Indian Philosophy*, Delhi: Motilal Banarsidass Publishers, 2014.

১০. Raghavan, V.,*"The Manu Samhita*"The Cultural Heritage of India, Vol. II, 1969.